দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবকোষ ও টিস্যু

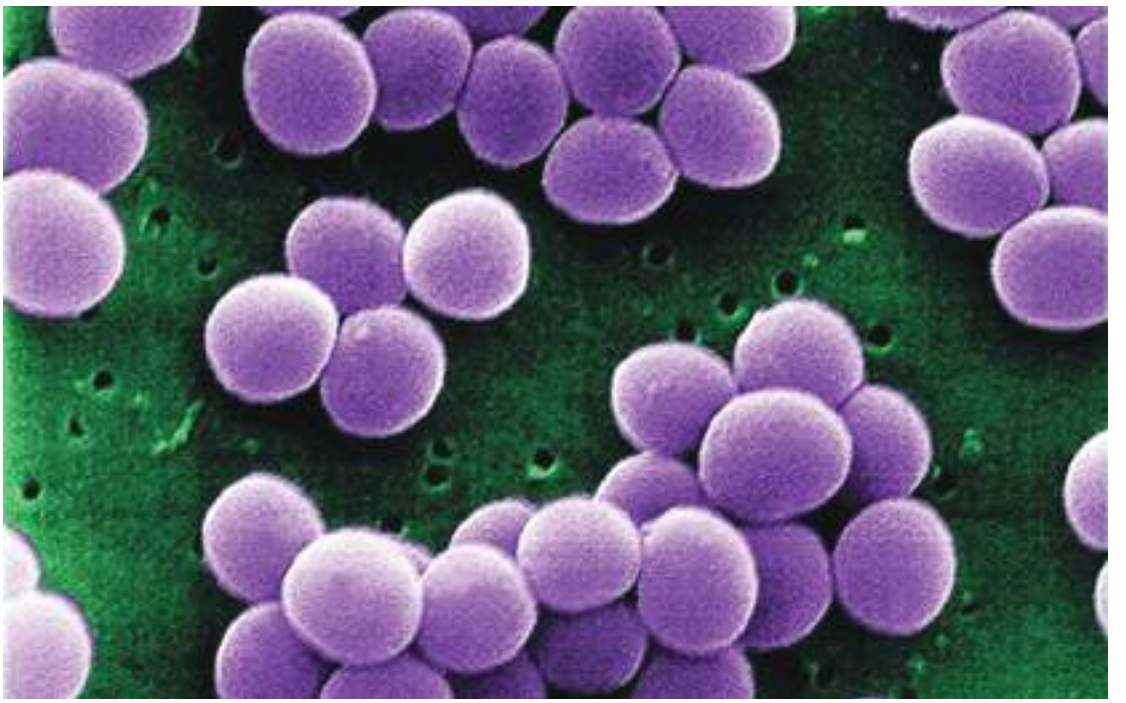

আগের শ্রেণিতে তোমরা জীবকোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলে। সেই সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তোমরা এই অধ্যায়ে জীবকোষ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি জীবকোষ আর ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ঐ একই জীবকোষের গঠন কি এক রকম? এই অধ্যায়ে তোমরা এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পাবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের তুলনা করতে পারব;
- স্নায়ু, পেশি, রক্ত, ত্বক এবং অস্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- জীবদেহে কোষের উপযোগিতা মূল্যায়ন করতে পারব;
- উদ্ভিদ টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাণি টিস্যু ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একই রকম কোষ সমষ্টির ও একই কাজ সম্পন্ন করার ভিত্তিতে টিস্যুর কাজ মূল্যায়ন করতে পারব;
- টিস্যু, অঙ্গ এবং তন্ত্রে কোষের সংগঠন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টিস্যুতন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্রের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদকোষ (পেঁয়াজ) ও প্রাণিকোষ (মুখের অভ্যন্তরের আবরণী কোষ) পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব;
- উদ্ভিদ ও প্রাণিটিস্যুর চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করতে পারব;
- সঠিকভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারব;
- জীবের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

২.১ জীবকোষ

আগের শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে জীবকোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। এই জীবকোষ কী? কোনো কোনো বিজ্ঞানী জীবকোষকে জীবদেহের গঠন ও জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লোয়ি (Loewy) এবং সিকেভিজ (Siekevitz) 1969 সালে বৈষম্য ভেদ্য (selectively permeable) পর্দা দিয়ে আবৃত এবং জীবজ ক্রিয়াকলাপের একক যা অন্য সজীব মাধ্যম ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে, এমন সত্তাকে কোষ বলেছেন।

কোষের প্রকারভেদ

সকল জীবকোষ এক রকম নয়। এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য যেমন আছে, তেমনই আছে আকৃতি ও কাজের পার্থক্য। নিউক্লিয়াসের গঠনের ভিত্তিতে কোষ দুই ধরনের, আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ।

(a) আদিকোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ (Prokaryotic cell)

এ ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে না। এজন্য এদের আদিকোষ বা আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষও বলা হয়। এসব কোষের নিউক্লিয়াস কোনো পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে না, তাই নিউক্লিও-বস্তু সাইটোপ্লাজমে ছড়ানো থাকে। এসব কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি অঙ্গাণু থাকে না তবে রাইবোজোম থাকে। ক্রোমোজোমে কেবল DNA থাকে। নীলাভ সবুজ শৈবাল বা ব্যাকটেরিয়ায় এ ধরনের কোষ পাওয়া যায়।

(b) প্রকৃত কোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotic cell)

এসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (nuclear membrane) দিয়ে নিউক্লিও-বস্তু পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত। এসব কোষে রাইবোজোমসহ সকল অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে। ক্রোমোজোমে DNA, প্রোটিন, হিস্টোন এবং অন্যান্য উপাদান থাকে। অধিকাংশ জীবকোষ এ ধরনের হয়।

কাজের ভিত্তিতে প্রকৃত কোষ দুই ধরনের, দেহকোষ এবং জননকোষ।

দেহকোষ (Somatic cell): বহুকোষী জীবের দেহ গঠনে এসব কোষ অংশগ্রহণ করে। মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনের মাধ্যমে দেহকোষ বিভাজিত হয় এবং এভাবে দেহের বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনে দেহকোষ অংশ নেয়।

জননকোষ (Gametic cell): যৌন প্রজনন ও জনুঃক্রম দেখা যায়, এমন জীবে জননকোষ উৎপন্ন হয়। মিয়োসিস পদ্ধতিতে জনন মাতৃকোষের বিভাজন ঘটে এবং জনন কোষ উৎপন্ন হয়। অপত্য জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জনন মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে। পুং ও স্ত্রী জননকোষ মিলিত

হয়ে নতুন জীবের দেহ গঠনের সূচনা করে। পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট এই প্রথম কোষটিকে জাইগোট (Zygote) বলে। জাইগোট বারবার বিভাজনের মাধ্যমে জীবদেহ গঠন করে।

২.২ উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণু এবং তাদের কাজ

উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সকলেই প্রকৃত কোষী। প্রতিটি কোষ কতগুলো অঙ্গাণু নিয়ে তৈরি হয়।

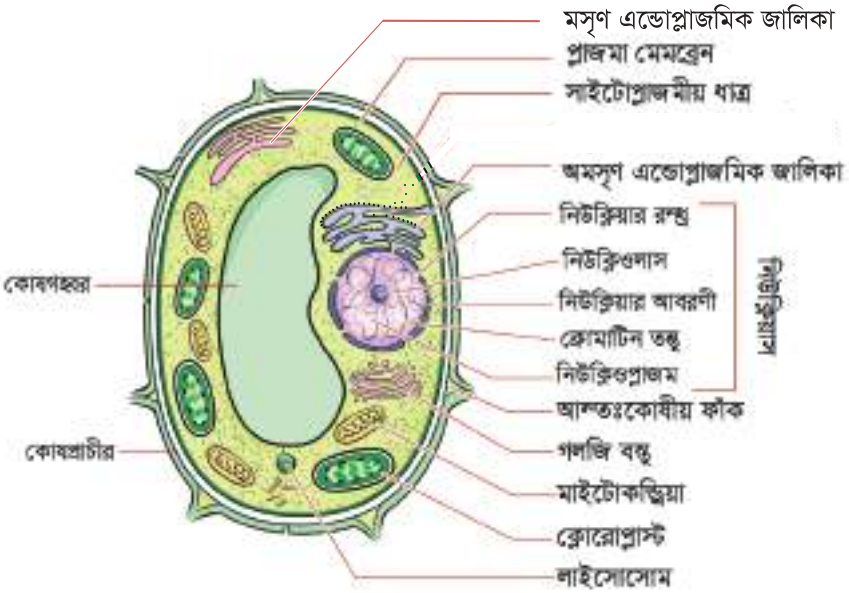

চিত্র ২.০১: উদ্ভিদকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ

চিত্র ২.০২: প্রাণিকোষের প্রধান অঙ্গাণুসমূহ

এসব অঙ্গাণুর অধিকাংশই উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কোষে থাকলেও কিছু অঙ্গাণু আছে, যা কেবল উদ্ভিদকোষে অথবা কেবল প্রাণিকোষে পাওয়া যায়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, এমন কিছু কোষ অঙ্গাণুর সাথে এবার আমরা পরিচিত হব।

কোষপ্রাচীর (cell wall)

কোষপ্রাচীর উদ্ভিদ কোষের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি মৃত বা জড়বস্তু দিয়ে তৈরি। প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল, এতে সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ থাকে। তবে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর প্রোটিন, লিপিড ও পলিস্যাকারাইড দিয়ে এবং ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন দিয়ে তৈরি। প্রাথমিক কোষ প্রাচীরটি এক স্তরবিশিষ্ট। মধ্য পর্দার উপর প্রোটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত কয়েক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য জমা হয়ে ক্রমশ গৌণপ্রাচীর সৃষ্টি হয়। এ প্রাচীরে মাঝে মাঝে ছিদ্র থাকে, যাকে কূপ বলে। কোষপ্রাচীর কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে, কোষের আকার ও আকৃতি বজায় রাখে। পাশের কোষের সাথে প্লাজমোডেজমাটা (আণুবীক্ষণিক নালি) সৃষ্টির মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

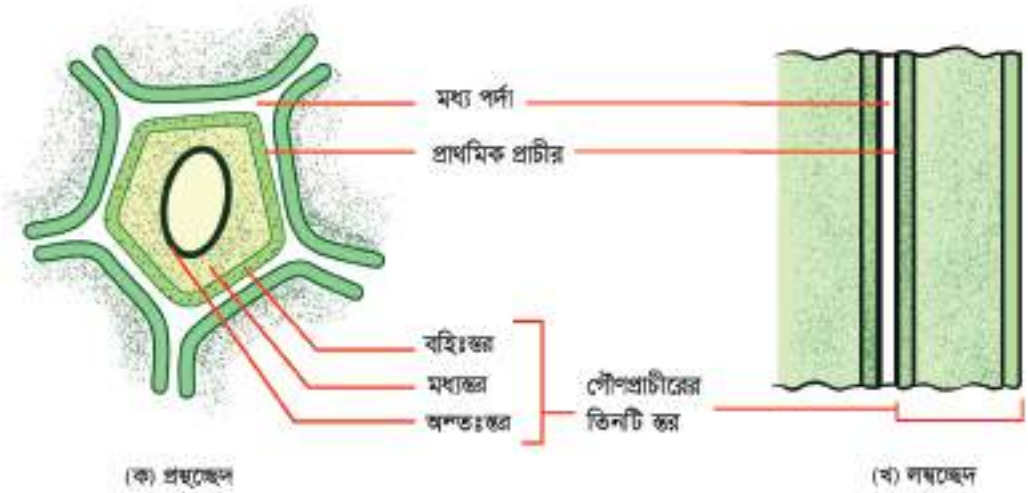

চিত্র ২.০৩: কোষপ্রাচীরের আণুবীক্ষণিক চিত্র

প্রোটোপ্লাজম

কোষের ভিতরে যে অর্ধস্বচ্ছ, থকথকে জেলির মতো বস্তু থাকে তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। কোষঝিল্লি দিয়ে ঘেরা সবকিছুই প্রোটোপ্লাজম, এমনকি কোষঝিল্লি নিজেও প্রোটোপ্লাজমের অংশ। কোষঝিল্লী ছাড়াও এখানে আছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলো এবং নিউক্লিয়াস।

২.২.১ কোষঝিল্লি (Plasmalemma)

প্রোটোপ্লাজমের বাইরে দুই স্তরের যে স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে, তাকে কোষঝিল্লি বা প্লাজমালেমা বা প্লাজমা মেমব্রেন বলে। কোষঝিল্লির ভাঁজকে মাইক্রোভিলাই বলে। এটি প্রধানত লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কোষঝিল্লি একটি বৈষম্যভেদ্য পর্দা হওয়ায় অভিস্রবণের মাধ্যমে পানি ও খনিজ লবণ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোকে পরস্পর থেকে আলাদা করে রাখে।

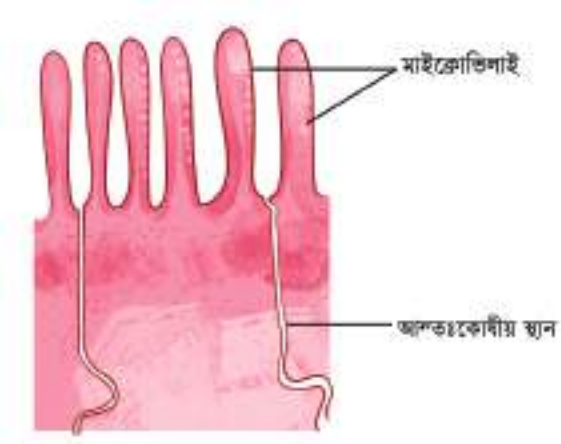

চিত্র ২.০৪: কোষঝিল্লি

২.২.২ সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু (Cytoplasmic organelles)

প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকাটিকে সরিয়ে দিলে যে জেলির মতো বস্তুটি থেকে যায় সেটিই সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্গাণু থাকে। এদের প্রত্যেকের কাজ আলাদা হলেও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই অঙ্গাণুগুলোর কোনো কোনোটি ঝিল্লিযুক্ত আবার কোনো কোনোটি ঝিল্লিবিহীন। অঙ্গাণুগুলো হচ্ছে:

ঝিল্লিযুক্ত সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

(a) মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria)

শ্বসনে অংশগ্রহণকারী এ অঙ্গাণুটি 1886 (মতান্তরে 1894) সালে আবিষ্কার করেন রিচার্ড অল্টম্যান এবং এর নাম দেন বায়োব্লাস্ট, তবে বর্তমানে প্রচলিত মাইটোকন্ড্রিয়া নামটি দেন বিজ্ঞানী কার্ল বেনডা। এটি দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণী বা ঝিল্লি দিয়ে ঘেরা। ভিতরের স্তরটি ভিতরের দিকে আঙ্গুলের মতো ভাঁজ হয়ে থাকে। এদের ক্রিস্টি (cristae) বলে। ক্রিস্টির গায়ে বৃন্তযুক্ত গোলাকার বস্তু থাকে, এদের অক্সিজোম (oxisomes) বলে। অক্সিজোমে উৎসেচকগুলো (enzymes) সাজানো থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়নের (এক বচন) ভিতরে থাকে ম্যাট্রিক্স (matrix)। জীবের শ্বসনকার্যে সাহায্য করা মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ। তোমরা পরে দেখবে যে শ্বসন ক্রিয়ার ধাপ চারটি: গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টি, ক্রেবস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্র। এর প্রথম

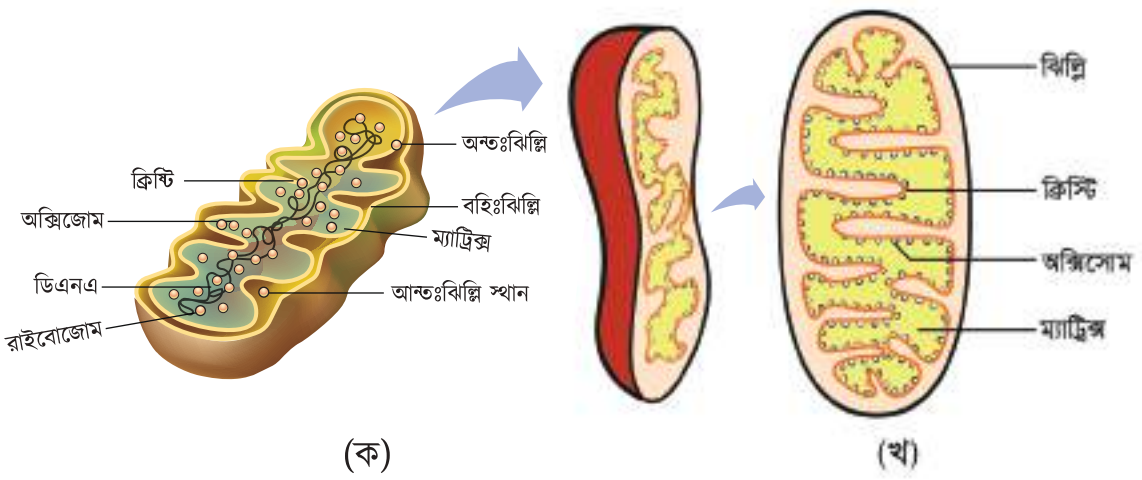

চিত্র ২.০৫: (ক) মাইটোকন্ড্রিয়া (খ) মাইটোকন্ড্রিয়ার লম্বচ্ছেদ

ধাপ (গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো) মাইটোকন্ড্রিয়ায় ঘটে না। তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। শ্বসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ক্রেবস চক্রে (তৃতীয় ধাপে) অংশগ্রহণকারী সব উৎসেচক উপস্থিত থাকায় এ বিক্রিয়াগুলো মাইটোকন্ড্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়। তোমরা দেখবে, ক্রেবস চক্রে সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপাদিত হয়। এজন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস বলা হয়। জীব তার বিভিন্ন কাজে এই শক্তি খরচ করে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষে মাইটোকন্ড্রিয়া পাওয়া যায়।

প্রাককেন্দ্রিক কোষে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না। এমনকি কিছু সুকেন্দ্রিক কোষেও (যেমন: *Trichomonas*, *Monocercomonoides* ইত্যাদি প্রোটোজোয়াতে) মাইটোকন্ড্রিয়া অনুপস্থিত। তাহলে এমন কি হতে পারে যে বিবর্তনীয় ইতিহাসের কোনো এক সময়ে সুকেন্দ্রিক কোষের ভিতর মাইটোকন্ড্রিয়া (কিংবা তার পূর্বসূরী) ঢুকে পড়েছিল এবং তারপর থেকে সেটি কোষের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে? এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-উপাত্ত থেকে এই ব্যাখ্যাটিই অনুমান করা হয়।

(b) প্লাস্টিড (Plastid)

বিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল 1866 সালে উদ্ভিদ কোষের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু প্লাস্টিড আবিষ্কার করেন। প্লাস্টিডের প্রধান কাজ খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং উদ্ভিদদেহকে বর্ণময় এবং আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা। প্লাস্টিড তিন ধরনের— ক্লোরোপ্লাস্ট, ক্রোমোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট।

(i) ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast): সবুজ রঙের প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। পাতা, কচি কান্ড ও অন্যান্য সবুজ অংশে এদের পাওয়া যায়। প্লাস্টিডের গ্রানা (grana) অংশ সূর্যালোককে আবদ্ধ করে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই আবদ্ধ সৌরশক্তি স্ট্রোমাতে (stroma) অবস্থিত উৎসেচক

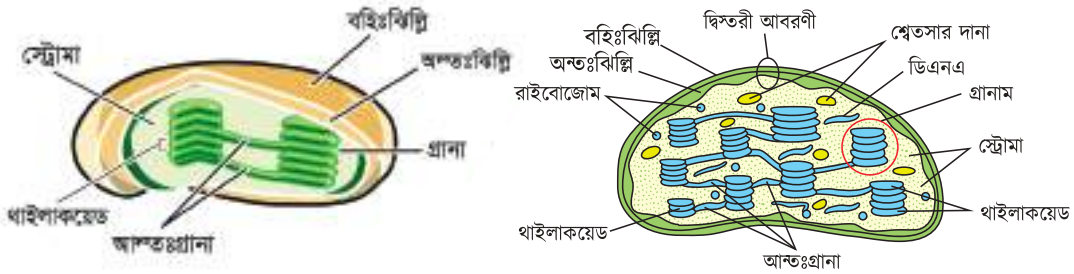

চিত্র ২.০৬: একটি প্লাস্টিড (খণ্ডিত)। ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ
(ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা এবং সরলভাবে উপস্থাপিত।)

সমষ্টি, বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কোষের ভেতরের পানি ব্যবহার করে সরল শর্করা তৈরি করে। এই প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল থাকে, তাই এদের সবুজ দেখায়। এছাড়া এতে ক্যারোটিনয়েড নামে এক ধরনের রঞ্জকও থাকে।

(ii) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast): এগুলো রঙিন প্লাস্টিড তবে সবুজ নয়। এসব প্লাস্টিডে জ্যান্থফিল (হলুদ), ক্যারোটিন (কমলা), ফাইকোএরিথ্রিন (লাল), ফাইকোসায়ানিন (নীল) ইত্যাদি রঞ্জক থাকে, তাই কোনোটিকে হলুদ, কোনোটিকে নীল আবার কোনোটিকে লাল দেখায়। এদের মিশ্রণজনিত কারণে ফুল, পাতা এবং উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রঙিন ফুল, পাতা এবং গাজরের মূলে এদের পাওয়া যায়। ফুলকে আকর্ষণীয় করে পরাগায়নে সাহায্য করা এদের প্রধান কাজ। এরা বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষণ করে জমা করে রাখে।

(iii) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast): যেসব প্লাস্টিডে কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না, তাদের লিউকোপ্লাস্ট বলে। যেসব কোষে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, (যেমন : মূল, ভ্রূণ, জননকোষ ইত্যাদি) সেখানে এদের পাওয়া যায়। এদের প্রধান কাজ খাদ্য সঞ্চয় করা। আলোর সংস্পর্শে এলে লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে।

একক কাজ

কাজ : প্লাস্টিডের চিত্র আঁকো।
উপকরণ : বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র, পোস্টার পেপার, সাইন পেন।
পদ্ধতি : বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিডের চিত্র এঁকে বোর্ডে ঝুলিয়ে দাও এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করো।

(c) গলজি বস্তু (Golgi body)

গলজি বস্তু (কিংবা গলগি বস্তু) প্রধানত প্রাণিকোষে পাওয়া যায়, তবে অনেক উদ্ভিদকোষেও এদের দেখা যায়। এটি সিস্টার্নি ও কয়েক ধরনের ভেসিকল নিয়ে তৈরি। এর পর্দায় বিভিন্ন উৎসেচকের পানি বিয়োজন সম্পন্ন হয়। জীবকোষে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসৃতকরণের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হরমোন নিঃসরণেও এর ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো বিপাকীয় কাজের সাথেও এরা সম্পর্কিত এবং কখনো কখনো এরা প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে।

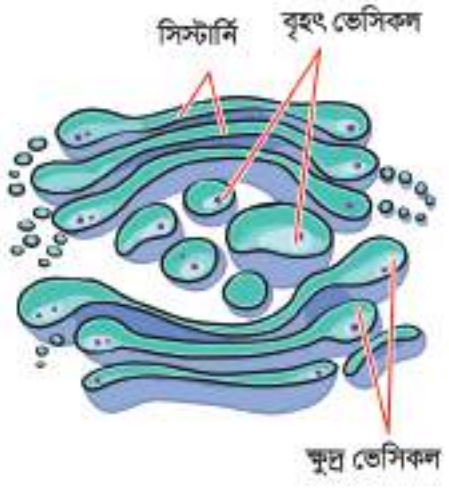

চিত্র ২.০৭: গলজি বস্তু

(d) এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম (Endoplasmic reticulum)

এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম-এর আবরণীর গায়ে প্রায়ই রাইবোজোম লেগে থাকে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এসব স্থানে প্রোটিন সংশ্লেষণের ঘটনা ঘটে। কোষে উৎপাদিত পদার্থগুলোর প্রবাহ পথ হিসেবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ব্যবহৃত হয়। এগুলো কখনো কখনো প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে যুক্ত থাকে। তাই ধারণা করা হয় যে, এক কোষ থেকে অন্য কোষে উৎসেচক ও কোষে উৎপাদিত অন্যান্য দ্রবাদি এর মাধ্যমে চলাচল করে। মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর এগুলো সৃষ্টিতে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষেই এরা উপস্থিত থাকে।

(e) কোষগহ্বর (Vacuole)

সাইটোপ্লাজমে কোষের মধ্যে যে আপাত ফাঁকা স্থান দেখা যায়, সেগুলোই হচ্ছে কোষগহ্বর। বৃহৎ কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান কাজ কোষরস ধারণ করা। বিভিন্ন ধরনের অজৈব লবণ, আমিষ, শর্করা, চর্বিজাতীয় পদার্থ, জৈব এসিড, রঞ্জক পদার্থ, পানি ইত্যাদি এই কোষরসে থাকে। প্রাণিকোষে কোষগহ্বর সাধারণত অনুপস্থিত থাকে, তবে যদি কখনো থাকে, তবে সেগুলো আকারে ছোট হয়।

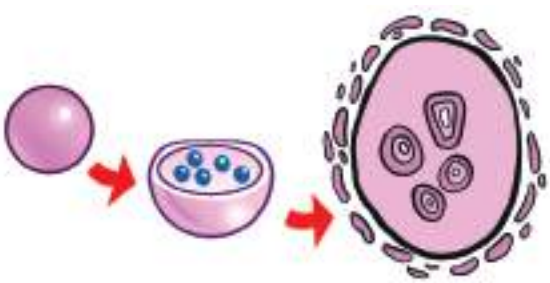

চিত্র ২.০৮: লাইসোজোম

(f) লাইসোজোম (Lysosome)

লিপিড আবরণ দ্বারা আবৃত কোষের অঙ্গাণু। লাইসোজোম জীবকোষকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। এর উৎসেচক আগত জীবাণুগুলোকে হজম করে ফেলে। এর পরিপাক করার উৎসেচকগুলো একটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে, তাই অন্যান্য অঙ্গাণু এর সংস্পর্শে এলেও হজম হয় না। দেহে অক্সিজেনের অভাব হলে বা বিভিন্ন

কারণে লাইসোজোমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর আশপাশের অঙ্গাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কখনো কখনো কোষটিই মারা যায়।

ঝিল্লিবিহীন সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু

(a) কোষকঙ্কাল (Cytoskeleton)

কোষঝিল্লি অতিক্রম করে কোষের ভেতরে ঢুকলে প্রথমেই কোষকঙ্কাল নজরে পড়বে। সেটি লম্বা এবং মোটা-চিকন মিলিয়ে অসংখ্য দড়ির মতো বস্তু যা কোষের চারদিকে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। কোষকঙ্কাল ভেতর থেকে কোষটিকে ধরে রাখে। অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন ইত্যাদি প্রোটিন দিয়ে কোষকঙ্কালের বিভিন্ন ধরনের তন্তু নির্মিত হয়। মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এ ধরনের তন্তুর উদাহরণ।

(b) রাইবোজোম (Ribosome)

প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের কোষেই এদের পাওয়া যায়। এই ঝিল্লিবিহীন বা পর্দাবিহীন অঙ্গাণুটি প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে। প্রোটিনের পলিপেপটাইড চেইন সংযোজন এই রাইবোজোমে হয়ে থাকে। এছাড়া রাইবোজোম এ কাজে প্রয়োজনীয় উৎসেচক সরবরাহ করে থাকে। উৎসেচক বা এনজাইমের কাজ হলো প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়িয়ে দেওয়া। উল্লেখ্য, মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স এবং প্লাস্টিডের স্ট্রোমাতেও রাইবোজোম থাকে, যেগুলো ঐ অঙ্গাণুসমূহের নিজস্ব ডিএনএ-এর সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়, ঠিক যেমন একটি ব্যাকটেরিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত রাইবোজোম সেই কোষের জন্য প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। জৈব অভিব্যক্তির ধারায় অন্য কোষের অংশ হয়ে ওঠার আগে এই দুটি অঙ্গাণু যে একসময় স্বাধীনভাবে বসবাস করতো, তার সপক্ষে এটিও একটি প্রমাণ।

(c) সেন্ট্রোজোম (Centrosome)

এটি প্রাণিকোষের বৈশিষ্ট্য, প্রধানত প্রাণিকোষে এদের পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ কোষে কদাচিৎ এদের দেখা যায়। প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে দুটি ফাঁপা নলাকার বা দণ্ডাকার অঙ্গাণু দেখা যায়, তাদের সেন্ট্রিওল বলে। সেন্ট্রিওলের চারপাশে অবস্থিত গাঢ় তরলকে সেন্ট্রোস্ফিয়ার এবং সেন্ট্রোস্ফিয়ারসহ সেন্ট্রিওলকে সেন্ট্রোজোম বলে। সেন্ট্রোজোমে থাকা সেন্ট্রিওল কোষ বিভাজনের সময় অ্যাস্টার রে তৈরি করে। এছাড়া স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টিতেও সেন্ট্রোজোমের অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ফ্লাজেলা সৃষ্টিতে এরা অংশগ্রহণ করে।

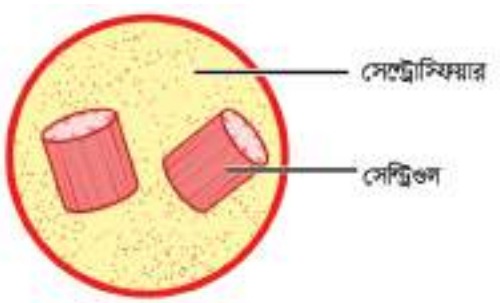

চিত্র ২.০৯: সেন্ট্রোজোম

২.২.৩ নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিকা (Nucleus)

জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে নির্দিষ্ট পর্দাঘেরা ক্রোমোজোম বহনকারী সুস্পষ্ট যে বস্তুটি দেখা যায় সেটিই হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এর আকৃতি গোলাকার, ডিম্বাকার বা নলাকার। সিভকোষ এবং স্তন্যপায়ীদের লোহিত

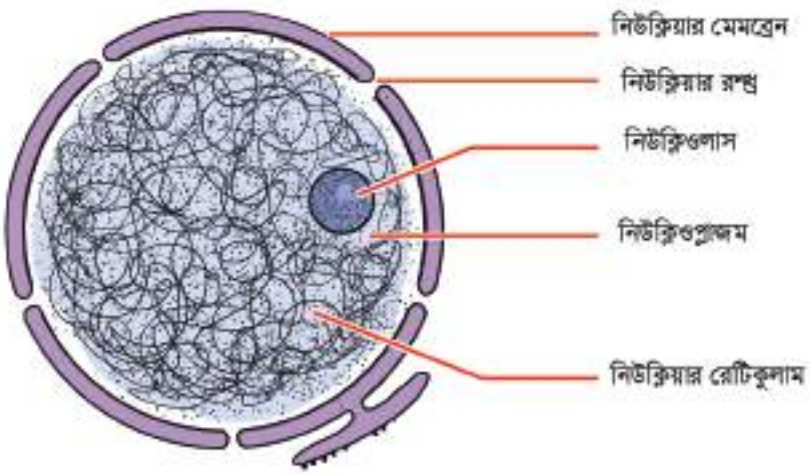

চিত্র ২.১০: নিউক্লিয়াস

রক্তকোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। নিউক্লিয়াসে বংশগতির বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এটি কোষে সংঘটিত বিপাকীয় কার্যাবলিসহ সব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুগঠিত নিউক্লিয়াসে নিচের অংশগুলো দেখা যায়।

(a) নিউক্লিয়ার ঝিল্লি (Nuclear membrane)

নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে যে ঝিল্লি, তাকে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা কেন্দ্রিকা ঝিল্লি বলে। এটি দুই স্তর বিশিষ্ট। এই ঝিল্লি লিপিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই ঝিল্লিতে মাঝে মাঝে কিছু ছিদ্র থাকে, যেগুলোকে নিউক্লিয়ার রন্ধ্র বলে। এই ছিদ্রের ভেতর দিয়ে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু বস্তু চলাচল করে। নিউক্লিয়ার ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের অন্যান্য বস্তুকে পৃথক রাখে এবং বিভিন্ন বস্তুর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

(b) নিউক্লিওপ্লাজম (Nucleoplasm)

নিউক্লিয়ার ঝিল্লির ভিতরে জেলির মতো বস্তু বা রস থাকে। একে কেন্দ্রিকারস বা নিউক্লিওপ্লাজম বলে। নিউক্লিওপ্লাজমে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন, উৎসেচক ও কতিপয় খনিজ লবণ থাকে।

(c) নিউক্লিওলাস (Nucleolus)

নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে ক্রোমোজোমের সাথে সংলগ্ন গোলাকার বস্তুকে নিউক্লিওলাস বা কেন্দ্রিকাণু বলে। ক্রোমোজোমের রংঅগ্রাহী অংশের সাথে এরা লেগে থাকে। এরা RNA ও প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। এরা রাইবোজোম সংশ্লেষণ করে।

(d) ক্রোমাটিন জালিকা (Chromatin reticulum)

বিভাজন চলছে না এমন কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতো জিনিস জট পাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এই সুতাগুলো হলো ক্রোমাটিন। ক্রোমাটিন (তথা ক্রোমোজোম) মূলত DNA এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত জটিল কাঠামো, যা জেনেটিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। চলন্ত অবস্থায় সিলিং ফ্যানের ব্লেড গোনা যেমন অসম্ভব, বিভাজন চলছে না এমন নিউক্লিয়াসে ক্রোমাটিন সুতা/তন্তু কতগুলো সেটা বোঝাও তেমনি অসম্ভব। জট পাকিয়ে থাকা সেই আলাদা

তন্তুগুলোকে একসাথে ক্রোমাটিন জালিকা (chromatin reticulum) বা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বলা হয়। কোষ বিভাজনের সময় সেই জট কিছুটা খুলে যায় এবং ক্রোমাটিনগুলো তখন আরো মোটা এবং খাটো হয়। সুকেন্দ্রিক কোষের ক্রোমাটিনগুলোকে তখন আলাদা আলাদা কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কোষবিভাজনের সময় মোটা ও খাটো হয়ে আলাদা হয়ে পড়া ক্রোমাটিনগুলোর আরেক নাম ক্রোমোজোম। বিভাজনের মেটাফেজ দশায় তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। মেটাফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোম বিভাজিত হয়ে ক্রোমোজোমজোড় গঠন করে যার দৈর্ঘ্য বরাবর অর্ধাংশকে বলে এক একটি ক্রোমাটিড। ক্রোমাটিডের (প্রায়) মধ্যবর্তী অংশে একটি সংকুচিত অঞ্চল থাকে যার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। কোষ বিভাজনের সময় সেন্ট্রোমিয়ারের যে অংশে স্পিন্ডল যন্ত্রের মাইক্রোটিউবিউল এসে যুক্ত হয় তাকে বলে কাইনেটোকোর। সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পাশে ক্রোমাটিডের অংশ দুটি হল তার দুটি বাহু (arm)। অ্যানাফেজ দশায় যখন সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর ক্রোমাটিড জোড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন প্রতিটি ক্রোমাটিডকেই এক একটি ক্রোমোজোম হিসেবে ধরা হয়। এ ব্যাপারে তৃতীয় অধ্যায়ে আরো জানতে পারবে।

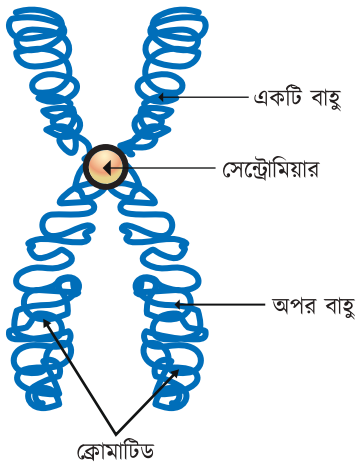

চিত্র ২.১১: একটি ক্রোমোজোম

একক কাজ

কাজ: এখানে আলোচিত কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর শ্রেণিবিভাগ একটি চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

২.৩ উদ্ভিদ ও প্রাণীর কাজ পরিচালনায় বিভিন্ন প্রকার কোষের ভূমিকা

কোষ জীবদেহের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) গঠনের একক। এককোষী ও বহুকোষী প্রাণীদের কোষের কাজ ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। পৃথিবীর আদি প্রাণের আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এককোষী প্রাণী প্রোটোজোয়া পর্বের প্রজাতিগুলো তাদের দেহের সব ধরনের ক্রিয়াকলাপ—যেমন খাদ্যগ্রহণ, দেহের বৃদ্ধি ও প্রজনন ঐ একটি কোষের মাধ্যমেই সম্পন্ন করে থাকে। বহুকোষী প্রাণীদের দেহকোষের মাঝে ভিন্নতা আছে, আছে বৈচিত্র্য।

২.৩.১ উদ্ভিদ টিস্যু (Plant tissue)

একই বা বিভিন্ন প্রকারের একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও

যদি অভিন্ন হয়, তখন তাদের টিস্যু বা কলা বলে। টিস্যু দুই ধরনের, ভাজক টিস্যু এবং স্থায়ী টিস্যু। ভাজক টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে সক্ষম কিন্তু স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো বিভাজিত হতে পারে না। স্থায়ী টিস্যু তিন ধরনের, যথা– সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু এবং নিঃস্রাবী (ক্ষরণকারী) টিস্যু। এখানে শুধু সরল এবং জটিল টিস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে।

(a) সরল টিস্যু (Simple tissue)

যে স্থায়ী টিস্যুর প্রতিটি কোষ আকার, আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে অভিন্ন, তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সরল টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা এবং স্ক্লেরেনকাইমা।

প্যারেনকাইমা (Parenchyma): উদ্ভিদদেহের সব অংশে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত, সমব্যাসীয়, পাতলা প্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ। এই টিস্যুতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক দেখা যায়। কোষপ্রাচীর পাতলা এবং সেলুলোজ দিয়ে তৈরি হয়। এসব কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন তাকে ক্লোরেনকাইমা (Chlorenchyma) বলে। জলজ উদ্ভিদের বড় বড় বায়ু-কুঠুরিযুক্ত প্যারেনকাইমাকে অ্যারেনকাইমা (Aerenchyma) বলে। প্যারেনকাইমা টিস্যুর প্রধান কাজ দেহ গঠন করা, খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য সঞ্চয় করা এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ করা।

কোলেনকাইমা (Collenchyma): এগুলো বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে তৈরি হয়। কোষপ্রাচীরে সেলুলোজ এবং পেকটিন জমা হয়ে পুরু হয় এবং কোনাগুলোকে পার্শ্বের প্রাচীরের তুলনায় অধিক মোটা দেখায়। তবে এদের কোষপ্রাচীর অসমভাবে পুরু এবং কোনাগুলো পেকটিন জমা হওয়ার কারণে অধিক পুরু হয়। এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাটে ও সজীব। এরা প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ কোষ দিয়ে তৈরি হয়। এতে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষপ্রান্ত চৌকোনাকার, সরু বা তির্যক হতে পারে। খাদ্য প্রস্তুত এবং উদ্ভিদদেহকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। পাতার শিরা এবং পত্রবৃন্তে এদের দেখা যায়। কচি ও নমনীয় কাণ্ড, যেমন কুমড়া ও দণ্ডকলসের কাণ্ডে এ টিস্যু দৃঢ়তা প্রদান করে। এ কোষে যখন ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, তখন এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma): এ টিস্যুর কোষগুলো শক্ত, অনেক লম্বা এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট হয়। প্রোটোপ্লাজমবিহীন, লিগনিনযুক্ত এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকে

চিত্র ২.১২: বিভিন্ন প্রকারের সরল টিস্যু– (ক) প্যারেনকাইমা (খ) কোলেনকাইমা (গ) স্ক্লেরেনকাইমা।

স্ক্লেরেনকাইমা টিস্যু বলে। প্রাথমিক অবস্থায় কোষগুলোতে প্রোটোপ্লাজম উপস্থিত থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তা নষ্ট হয়ে মৃত কোষে পরিণত হয়। কোষগুলো প্রধানত দুই ধরনের, ফাইবার এবং স্ক্লেরাইড। উদ্ভিদদেহে দৃঢ়তা প্রদান এবং পানি ও খনিজ লবণ পরিবহণ করা এর মূল কাজ।

(i) ফাইবার বা তন্তু (Fibre): এরা অত্যন্ত দীর্ঘ, পুরু প্রাচীরযুক্ত, শক্ত এবং এদের দুই প্রান্ত সরু। তবে কখনো কখনো ভোঁতা হতে পারে। প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র থাকে, এ ছিদ্রকে কূপ বলে। অবস্থান এবং গঠনের ভিত্তিতে এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন বাস্ট ফাইবার, সার্ফেস ফাইবার, জাইলেম তন্তু বা কাষ্ঠতন্তু।

(ii) স্ক্লেরাইড (Sclereids): এদেরকে স্টোন সেলও বলা হয়। এরা খাটো, সমব্যাসীয়, কখনো লম্বাটে আবার কখনো তারকাকার হতে পারে। এদের গৌণপ্রাচীর খুবই শক্ত, অত্যন্ত পুরু এবং লিগনিনযুক্ত। পরিণত স্ক্লেরাইড কোষ সাধারণত মৃত থাকে এবং এদের কোষপ্রাচীর কূপযুক্ত হয়।

নগ্নবীজী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কর্টেক্স, ফল ও বীজত্বকে স্ক্লেরাইড টিস্যু দেখা যায়। বহিঃত্বক জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের সাথে একত্রে পত্রবৃন্তে কোষগুচ্ছরূপে থাকতে পারে।

একক কাজ

কাজ : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিত্র অঙ্কন।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, সাইনপেন।

পদ্ধতি : তিন ধরনের সরল টিস্যুর চিহ্নিত চিত্র আঁকো এবং এদের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন করো।

(b) জটিল টিস্যু (Complex tissues)

বিভিন্ন ধরনের কোষের সমন্বয়ে যে স্থায়ী টিস্যু তৈরি হয়, তাকে জটিল টিস্যু বলে। এরা উদ্ভিদে পরিবহণের কাজ করে, তাই এদের পরিবহণ টিস্যুও বলা হয়। এ টিস্যু দুই ধরনের, জাইলেম এবং ফ্লোয়েম। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একত্রে উদ্ভিদের পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ (vascular bundle) গঠন করে।

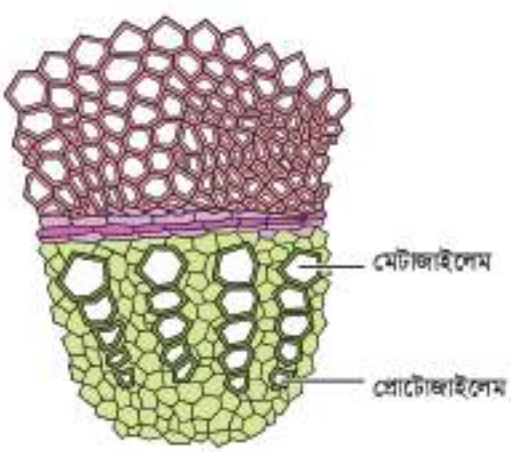

চিত্র ২.১৩: একটি পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ

জাইলেম (Xylem): জাইলেম দুই ধরনের, প্রাথমিক ও গৌণ বা সেকেন্ডারি জাইলেম। প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্ট জাইলেমকে প্রাথমিক জাইলেম বলে। প্রাথমিক বৃদ্ধি শেষে যেসব ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি বৃদ্ধি ঘটে, সেখানে সেকেন্ডারি জাইলেম সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক জাইলেম দুই ধরনের।

প্রাথমিক অবস্থায় একে প্রোটোজাইলেম এবং পরিণত অবস্থায় মেটাজাইলেম বলে। মেটাজাইলেমের অভ্যন্তরীণ ফাঁকা গহ্বরটি বড় থাকে। জাইলেমে কয়েক ধরনের কোষ থাকে, যেমন: ট্রাকিড, ভেসেল, জাইলেম প্যারেনকাইমা ও জাইলেম ফাইবার।

(i) ট্রাকিড (Tracheids): ট্রাকিড কোষ লম্বা। এর প্রান্তদ্বয় সরু এবং সুচালো। প্রাচীরে লিগনিন জমা হয়ে পুরু হয় এবং অভ্যন্তরীণ গহ্বর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানির চলাচল পাশাপাশি জোড়া কূপের (paired pits) মাধ্যমে হয়ে থাকে। প্রাচীরের পুরুত্ব কয়েক ধরনের হয়, যেমন- বলয়াকার, সর্পিলাকার, সোপানাকার, জালিকাকার কিংবা কূপাঙ্কিত। ফার্নবর্গ, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি জাইলেম কলায় ট্রাকিড দেখা যায়। কোষরসের পরিবহণ এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এদের প্রধান কাজ। তবে কখনো কখনো খাদ্য সঞ্চয়ের কাজও এই টিস্যু করে থাকে।

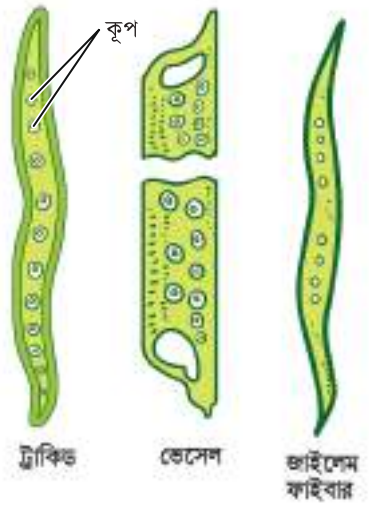

চিত্র ২.১৪: বিভিন্ন ধরনের জাইলেম

(ii) ভেসেল (Vessels): ভেসেল কোষগুলো খাটো চোঙের মতো। কোষগুলো একটির মাথায় আরেকটি সজ্জিত হয় এবং প্রান্তীয় প্রাচীরটি গলে গিয়ে একটি দীর্ঘ নলের মতো অঙ্গের সৃষ্টি করে। এর ফলে কোষরসের উপরে ওঠার জন্য একটি সরু পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো প্রোটোপ্লাজমপূর্ণ থাকলেও পরিণত বয়সে এরা মৃত এবং প্রোটোপ্লাজমবিহীন হয়। ভেসেলের প্রাচীর ট্রাকিডের মতো বিভিন্নরূপে পুরু হয়, যেমন- সোপানাকার, সর্পিলাকার, বলয়াকার, কূপাঙ্কিত ইত্যাদি। ভেসেল সাধারণত কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা হয়। তবে বৃক্ষ বা আরোহী উদ্ভিদে আরও অনেক লম্বা হতে পারে। এদের প্রধানত গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সব অঙ্গে দেখা যায়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের মধ্যে উন্নত উদ্ভিদ, যেমন নিটামে *(Gnetum)* প্রাথমিক পর্যায়ের ভেসেল থাকে। পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহণ এবং অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

(iii) জাইলেম প্যারেনকাইমা (Xylem parenchyma): জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষকে জাইলেম প্যারেনকাইমা বা উড প্যারেনকাইমা (wood parenchyma) বলে। এদের প্রাচীর পুরু বা পাতলা হতে পারে। প্রাইমারি জাইলেমে অবস্থিত প্যারেনকাইমার কোষ পাতলা প্রাচীরযুক্ত । তবে সেকেন্ডারি জাইলেমে এরা পুরু প্রাচীরযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য সঞ্চয় এবং পানি পরিবহণ করা এদের প্রধান কাজ।

(iv) জাইলেম ফাইবার (Xylem fibre): জাইলেমে অবস্থিত স্ক্লেরেনকাইমা কোষই হচ্ছে জাইলেম ফাইবার। এদের উড ফাইবারও বলে। এ কোষগুলো লম্বা, এদের দুপ্রান্ত সরু। পরিণত কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বলে এরা মৃত। উদ্ভিদে এরা যান্ত্রিক শক্তি যোগায়। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের সব জাইলেমে এরা অবস্থান করে। পানি ও খনিজ পদার্থ পরিবহণ, খাদ্য সঞ্চয়, উদ্ভিদকে যান্ত্রিক শাক্তি আর দৃঢ়তা প্রদান করা জাইলেম টিস্যুর প্রধান কাজ।

ফ্লোয়েম (Phloem): উদ্ভিদ কাণ্ডে এরা জাইলেমের সাথে একত্রে পরিবহণ টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। সিভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম তন্তু নিয়ে ফ্লোয়েম টিস্যু গঠিত হয়।

জাইলেম যেমন খাদ্যের কাঁচামাল পানি সরবরাহ করে, তেমনি ফ্লোয়েম পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবহণ করে।

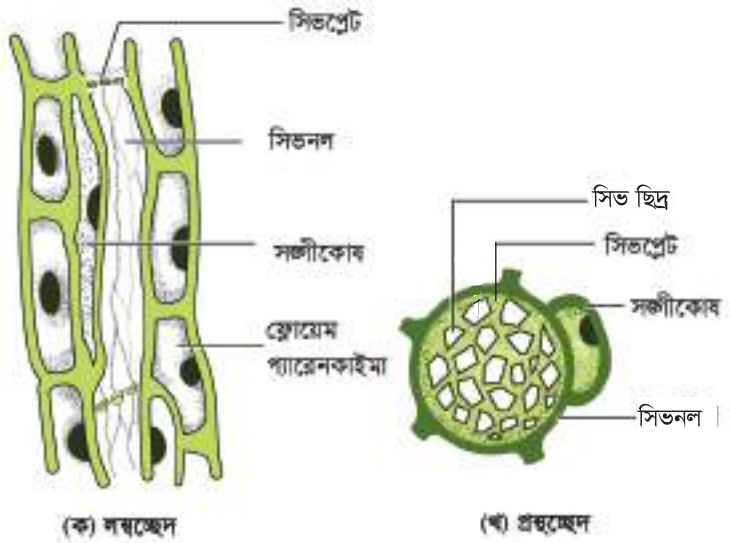

চিত্র ২.১৫: ফ্লোয়েম টিস্যু

(i) সিভকোষ (Sieve cell): এগুলো বিশেষ ধরনের কোষ। দীর্ঘ, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং জীবিত এ কোষগুলো লম্বালম্বিভাবে একটির উপর একটি সজ্জিত হয়ে সিভনল (Sieve tube) গঠন করে। এ কোষগুলো চালুনির মতো ছিদ্রযুক্ত সিভপ্লেট দিয়ে পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। সিভকোষে প্রোটোপ্লাজম প্রাচীর ঘেঁষে থাকে বলে একটি কেন্দ্রীয় ফাঁপা জায়গার সৃষ্টি হয়, যেটা খাদ্য পরিবহনের নল হিসেবে কাজ করে। এদের প্রাচীর লিগনিনযুক্ত। পরিণত সিভকোষে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না। সকল ধরনের গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষ এবং সিভনল থাকে। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহণ করা এদের প্রধান কাজ।

(ii) সঙ্গীকোষ (Companion cell): প্রতিটি সিভকোষের সাথে একটি করে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ অবস্থান করে। এদের কেন্দ্রিকা বা নিউক্লিয়াস বেশ বড়। ধারণা করা হয় এই

নিউক্লিয়াস সিভকোষের কার্যাবলি কিছু পরিমাণে হলেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ এবং পাতলা প্রাচীরযুক্ত। ফার্ন ও নগ্নবীজী উদ্ভিদে এদের উপস্থিতি নেই।

(iii) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা (Phloem parenchayma): ফ্লোয়েমে উপস্থিত প্যারেনকাইমা কোষগুলোই ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা। এদের কোষ সাধারণ প্যারেনকাইমার মতো পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত এবং প্রোটোপ্লাজমযুক্ত। এরা খাদ্য সঞ্চয় করে এবং খাদ্য পরিবহণে সহায়তা করে। ফার্ন জাতীয় (Pteridophyta) উদ্ভিদ, নগ্নবীজী (Gymnosperm) উদ্ভিদ এবং দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledonous) উদ্ভিদের ফ্লোয়েম টিস্যুতে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না।

(iv) ফ্লোয়েম ফাইবার বা তন্তু (Phloem fibre): স্ক্লেরেনকাইমা কোষ সমন্বয়ে ফ্লোয়েম ফাইবার তৈরি হয়। এগুলো একধরনের দীর্ঘ কোষ, যাদের প্রান্তদেশ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। এদের বাস্ট ফাইবারও বলে। পাটের আঁশ এক ধরনের বাস্ট ফাইবার। উদ্ভিদ অঙ্গের গৌণবৃদ্ধির সময় এ ফাইবার উৎপন্ন হয়। এসব কোষের প্রাচীরে কূপ দেখা যায়। ফ্লোয়েম টিস্যুর মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত শর্করা এবং মূলে সঞ্চিত খাদ্য একই সাথে উপরে নিচে পরিবাহিত হয়।

২.৩.২ প্রাণিটিস্যু

বহুকোষী প্রাণিদেহে অনেক কোষ একত্রে কোনো বিশেষ কাজে নিয়োজিত থাকে। একই ভ্রূণীয় কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এক বা একাধিক ধরনের কিছুসংখ্যক কোষ জীবদেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে সমষ্টিগতভাবে একটা কাজে নিয়োজিত থাকলে ঐ কোষগুলো সমষ্টিগতভাবে টিস্যু (Tissue) বা তন্ত্র তৈরি করে। একটি টিস্যুর কোষগুলোর উৎপত্তি, কাজ এবং গঠন একই ধরনের হয়। টিস্যু নিয়ে আলোচনাকে টিস্যুতত্ত্ব (Histology) বলে। কোষ এবং টিস্যুর মধ্যে পার্থক্য খুবই নির্দিষ্ট। কোষ হচ্ছে টিস্যুর গঠনগত ও কার্যকরী একক, যেমন লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ। আবার এরা একত্রে তরল যোজক টিস্যু নামে এক ধরনের টিস্যু হিসেবে পরিচিত। তরল যোজক টিস্যু রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশ নেয়।

মানবদেহে নানা ধরনের কোষ আছে, যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিয়োজিত। মানবদেহের স্নায়ুকোষ দেহজুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। দেহের যেকোনো অংশের উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করা, আবার মস্তিষ্কের কোনো বার্তা শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেওয়াই এদের কাজ। চোখের স্নায়ুকোষগুলো দেখতে এবং কানের স্নায়ুকোষগুলো শুনতে সাহায্য করে। মানুষের চোখের মতো বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুকোষ না থাকায় বেশিরভাগ প্রাণীই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুগুলো রঙিন হিসেবে দেখতে পারে না, অনেক প্রাণী শুধু দিনে বা রাতে দেখতে পায়। আমাদের কাজকর্মে, হাঁটা-চলায় এবং নড়াচড়ায় পেশিকোষ ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের রক্তকোষ মানব দেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। লোহিত রক্তকণিকা কোষগুলো ফুসফুসে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং হৃদযন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মাধ্যমে কৈশিকনালি হয়ে দেহের প্রতিটি

কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বেত রক্তকণিকা দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্তের অণুচক্রিকা কোষগুলো শরীরের কেটে যাওয়া অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে। শরীরের ত্বকীয় কোষগুলো দেহের আবরণ দেওয়া ছাড়াও শরীরের অবস্থানভেদে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। মাথার ত্বকীয় কোষগুলো থেকে চুল গজিয়ে থাকে। শরীরের ত্বকের ঘাম নির্গমনকারী কোষগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ঘাম নির্গত করে। অস্থিকোষ দেহে অস্থি অথবা কোমলাস্থি তৈরি করে দেহের দৃঢ়তা দিয়ে থাকে। দেহের আকার, গঠন, অস্থির বৃদ্ধি ইত্যাদিতে অস্থিকোষের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিটিস্যুর প্রকারভেদ: প্রাণিটিস্যু তার গঠনকারী কোষের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিঃসৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রধানত চার ধরনের হয়— আবরণী টিস্যু, যোজক টিস্যু, পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু।

(a) আবরণী টিস্যু (Epithelial Tissue)

এই টিস্যু বিভিন্ন অঙ্গের আবরণ (lining) হিসেবে কাজ করে। তবে অঙ্গকে আবৃত রাখাই আবরণী টিস্যুর একমাত্র কাজ নয়। এই টিস্যুর কাজ হলো: অঙ্গকে আবৃত রাখা, সেটিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা (protection) করা, প্রোটিনসহ বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ বা নিঃসরণ (secretion) করা, বিভিন্ন পদার্থ শোষণ (absorption) করা এবং কোষীয় স্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পদার্থের পরিবহণ (transcellular transport) করা ।

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো ঘন সন্নিবেশিত এবং একটি ভিত্তিপর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে। কোষের আকৃতি, প্রাণিদেহে তার অবস্থান এবং কাজের প্রকৃতিভেদে এ টিস্যু তিন ধরনের হয়। যেমন:

(i) স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু (Squamous Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষগুলো মাছের আঁশের মতো চ্যাপটা এবং এদের নিউক্লিয়াস বড় আকারের হয়। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল প্রাচীর। এই টিস্যু প্রধানত আবরণ ছাড়াও ছাঁকনির কাজ করে থাকে।

(ii) কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু (Cuboidal Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষগুলো ঘনাকার বা কিউব আকৃতির অর্থাৎ কোষগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় সমান। উদাহরণ: বৃক্কের সংগ্রাহক

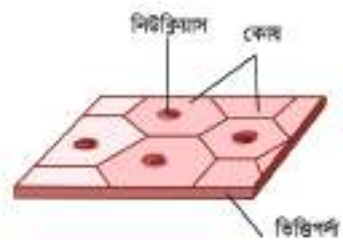

চিত্র ২.১৬: স্কোয়ামাস (আঁইশাকার) আবরণী টিস্যু

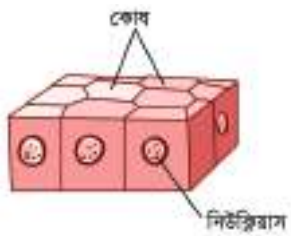

চিত্র ২.১৭: কিউবয়ডাল (ঘনাকৃতি) আবরণী টিস্যু

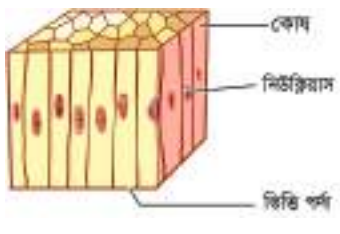

চিত্র ২.১৮: কলামনার (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়াল টিস্যু

নালিকা। এই টিস্যু প্রধানত পরিশোষণ এবং আবরণ কাজে লিপ্ত থাকে।

(iii) কলামনার আবরণী টিস্যু (Columnar Epithelial Tissue): এই টিস্যুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা। উদাহরণ: প্রাণীর অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের কোষগুলো প্রধানত ক্ষরণ, রক্ষণ এবং শোষণের কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে ভিত্তিপর্দার উপর সজ্জিত কোষগুলোর সংখ্যার ভিত্তিতে এপিথেলিয়াল বা আবরণী টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সাধারণ আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দার উপর কোষসমূহ এক স্তরে সজ্জিত। উদাহরণ: বৃক্কের বোম্যান্স ক্যাপসুল, বৃক্কের সংগ্রাহক নালিকা, অন্ত্র প্রাচীর।

(ii) স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু: ভিত্তিপর্দার উপর কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত। এমন স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যুও আছে, যার স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে—কখনো দেখা যায় তিন-চারটি স্তর আবার পরক্ষণেই দেখা যায় সাত-আটটি স্তর। তাই একে বলে ট্রানজিশনাল আবরণী। উদাহরণ: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক।

(iii) সিউডো-স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু: এই টিস্যুর কোষগুলো ভিত্তিপর্দার উপর এক স্তরে বিন্যস্ত থাকে। তবে কোষগুলো বিভিন্ন উচ্চতার হওয়ায় এই টিস্যুকে দেখতে স্তরীভূত টিস্যু মনে হয়। উদাহরণ ট্রাকিয়া।

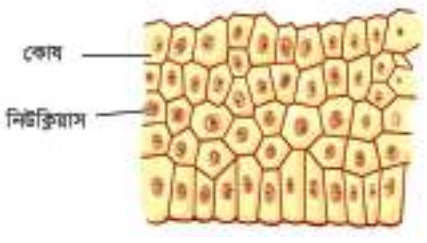

চিত্র ২.১৯: স্ট্র্যাটিফাইড (স্তরীভূত) বা যৌগিক আবরণী টিস্যু

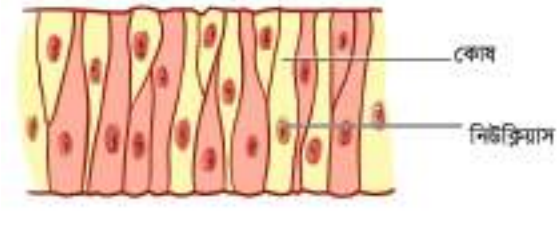

চিত্র ২.২০: সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড এপিথেলিয়াল টিস্যু

আবরণী টিস্যুর কোষগুলো আবার বিভিন্ন কাজের জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন:

(i) সিলিয়াযুক্ত আবরণী টিস্যু: মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বাসনালির প্রাচীরে দেখা যায়।

(ii) ফ্লাজেলাযুক্ত আবরণী টিস্যু: হাইড্রার এন্ডোডার্মে থাকে।

(iii) ক্ষণপদযুক্ত আবরণী টিস্যু: হাইড্রার এন্ডোডার্মে এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্ত্রে দেখা যায়।

(iv) জনন অঙ্গের আবরণী টিস্যু: বিশেষভাবে রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু, যা থেকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন হয়। এরা প্রজননে অংশগ্রহণ করে প্রজাতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে।

(v) গ্রন্থি আবরণী টিস্যু: বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসরণ করে।

আবরণী টিস্যু কোনো অঙ্গের বা নালির ভিতরের ও বাইরের অংশ তৈরি করে থাকে। আবার এই টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে রক্ষণ, ক্ষরণ, শোষণ, ব্যাপন, পরিবহণ— এই সব কাজে অংশ নেয়। আবরণী টিস্যু রূপান্তরিত হয়ে গ্রন্থি টিস্যু এবং জনন টিস্যুতে পরিণত হয় এবং দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(b) যোজক টিস্যু (Connective Tissue)

যোজক বা কানেকটিভ টিস্যুতে মাতৃকার (Matrix) পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি এবং কোষের সংখ্যা কম। গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে কানেকটিভ টিস্যু প্রধানত তিন ধরনের হয়। যথা-

(i) ফাইব্রাস যোজক টিস্যু (Fibrous Connective Tissue): এই ধরনের যোজক টিস্যু দেহত্বকের নিচে পেশির মধ্যে থাকে। এদের মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের তন্তুর আধিক্য দেখা যায়।

(ii) স্কেলিটাল যোজক টিস্যু (Skeletal Connective Tissue): দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠনকারী টিস্যুকে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু বলে। এই টিস্যু দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে। দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি এবং দৃঢ়তা দেয়। অঙ্গ সঞ্চালন এবং চলনে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড— এরকম দেহের নরম ও নাজুক অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা উৎপাদন করে। ঐচ্ছিক পেশিগুলোর সংযুক্তির ব্যবস্থা করে। গঠনের ভিত্তিতে স্কেলিটাল যোজক টিস্যু দুধরনের হয়। যেমন: কোমলাস্থি এবং অস্থি।

কোমলাস্থি (Cartilage): কোমলাস্থি এক ধরনের নমনীয় স্কেলিটাল যোজক টিস্যু। মানুষের নাক ও কানের পিনা কোমলাস্থি দিয়ে তৈরি।

অস্থি: অস্থি বিশেষ ধরনের দৃঢ়, ভঙ্গুর এবং অনমনীয় স্কেলিটাল কানেকটিভ টিস্যু। এদের মাতৃকায় ক্যালসিয়াম-জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।

(iii) তরল যোজক টিস্যু (Fluid connective tissue): তরল টিস্যুর মাতৃকা তরল। মাতৃকায় বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই টিস্যুর প্রধান কাজ দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণ করা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং রক্ত জমাট বাঁধায় বিশেষ ভূমিকা রাখা। তরল যোজক টিস্যু দুই ধরনের, রক্ত এবং লসিকা।

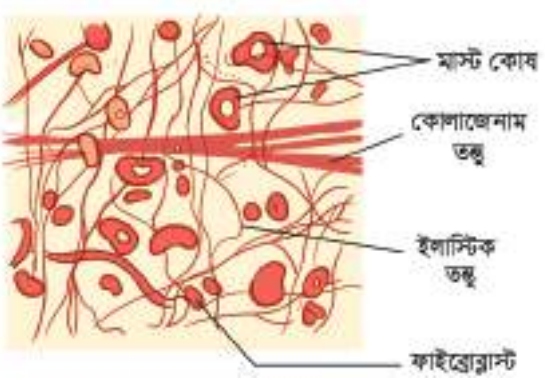

চিত্র ২.২১: কানেক্টিভ টিস্যু

রক্ত: রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয়, ঈষৎ লবণাক্ত এবং লালবর্ণের তরল যোজক টিস্যু। ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত অভ্যন্তরীণ পরিবহণে অংশ নেয়। উষ্ণ রক্তবাহী প্রাণীর দেহে রক্ত তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে। রক্তের উপাদান দুটি— রক্তরস (55%) এবং রক্তকোষ (45%) । রক্তরস (Plasma) রক্তের তরল অংশ, এর রং ঈষৎ হলুদাভ। এর প্রায় 91-92% অংশ পানি এবং 8-9% অংশ জৈব ও অজৈব পদার্থ। এসব রক্তরসের ভিতর বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং বর্জ্য পদার্থ থাকে। রক্তকোষ তিন ধরনের, যথা- লোহিত রক্তকোষ (Erythrocyte বা Red blood cells বা RBC), শ্বেত রক্তকোষ (Leukocyte বা white blood cells বা WBC) এবং অণুচক্রিকা (Thrombocytes বা Blood platelet)। লোহিত রক্তকোষ হিমোগ্লোবিন নামে একটি লৌহজাত যৌগ থাকে, যার জন্য রক্ত লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে অক্সিজেন পরিবহণ করে। শ্বেত রক্তকোষ জীবাণু ধ্বংস করে দেহের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষায় অংশ নেয়। মানবদেহে বেশ কয়েক ধরনের শ্বেত রক্তকোষ থাকে। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট

চিত্র ২.২২: বিভিন্ন ধরনের রক্তকোষ

বাঁধায় অংশ নেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রক্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

লসিকা: মানবদেহে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে (Intercellular space) যে জলীয় পদার্থ জমা হয় তাকে লসিকা বলে। এগুলো ছোট নালির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে, যাকে লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system) বলে। লসিকা ঈষৎ ক্ষারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। এর মধ্যে কিছু রোগপ্রতিরোধী কোষ থাকে, এদের লসিকাকোষ (Lymphoid cell) বলে।

(c) পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

ভ্রূণের মেসোডার্ম থেকে তৈরি সংকোচন ও প্রসারণক্ষম বিশেষ ধরনের টিস্যুকে পেশি টিস্যু বলে। এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত। পেশিকোষগুলো সরু, লম্বা এবং তন্তুময়। যেসব তন্তুতে আড়াআড়ি ডোরাকাটা থাকে, তাদের ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle) এবং ডোরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি (Smooth muscle) বলে। পেশিকোষ সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, চলন ও

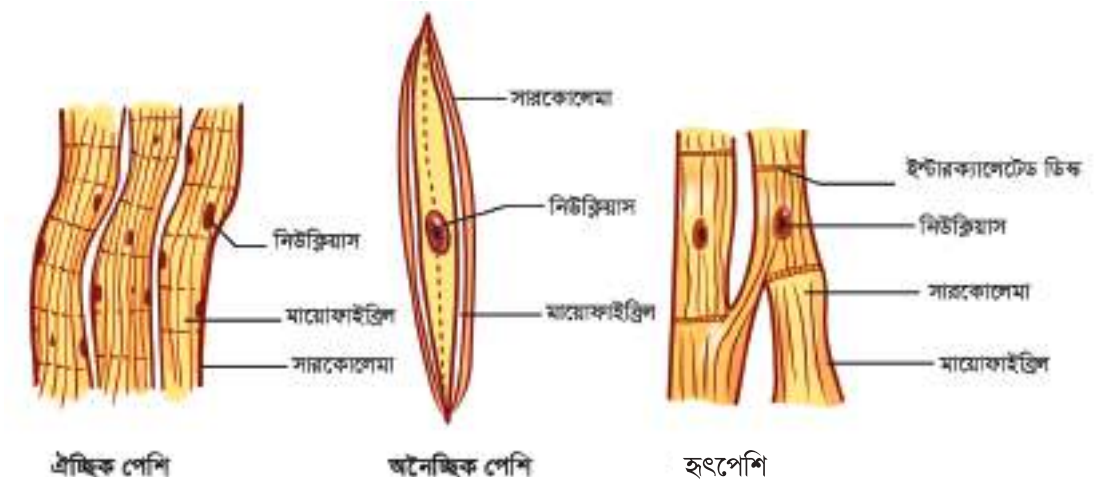

চিত্র ২.২৩: বিভিন্ন ধরনের পেশি

অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ঘটায়। অবস্থান, গঠন এবং কাজের ভিত্তিতে পেশি টিস্যু তিন ধরনের, ঐচ্ছিক পেশি, অনৈচ্ছিক পেশি এবং হৃৎপেশি।

(i) ঐচ্ছিক পেশি (Voluntary) বা ডোরাকাটা পেশি (Striated muscle): এই পেশি প্রাণীর ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। ঐচ্ছিক পেশিটিস্যুর কোষগুলো নলাকার, শাখাবিহীন ও আড়াআড়ি ডোরাযুক্ত হয়। এদের সাধারণত একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। এই পেশি দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হতে পারে। ঐচ্ছিক পেশি অস্থিতন্ত্রের সংলগ্ন থাকায় একে কঙ্কালপেশিও বলে। উদাহরণ: মানুষের হাত এবং পায়ের পেশি।

(ii) অনৈচ্ছিক পেশি (Involuntary muscle) বা মসৃণ পেশি (Smooth muscle): এই পেশি টিস্যুর সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। এ পেশি কোষগুলো মাকু আকৃতির। এদের গায়ে আড়াআড়ি দাগ থাকে না। এজন্য এ পেশিকে মসৃণ পেশি বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তনালি, পৌষ্টিকনালি ইত্যাদির প্রাচীরে অনৈচ্ছিক পেশি থাকে। অনৈচ্ছিক পেশি প্রধানত দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গাদির সঞ্চালনে অংশ নেয়। যেমন : খাদ্য হজম প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের ক্রমসংকোচন।

(iii) কার্ডিয়াক পেশি বা হৃৎপেশি (Cardiac muscle): এই পেশি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি। এই টিস্যুর কোষগুলো নলাকৃতি (অনেকটা ঐচ্ছিক পেশির মতো), শাখান্বিত ও আড়াআড়ি দাগযুক্ত। এ টিস্যুর কোষগুলোর মধ্যে ইন্টারক্যালাটেড ডিস্ক (Intercalated disc) থাকে। এদের সংকোচন ও প্রসারণ প্রাণীর ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশির গঠন ঐচ্ছিক পেশির মতো হলেও কাজ অনৈচ্ছিক পেশির মতো। তাই একে ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক পেশিও বলে। কার্ডিয়াক পেশির কোষগুলো শাখার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের সব কার্ডিয়াক পেশি সমন্বিতভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। মানব ভ্রূণ সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায় থেকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কার্ডিয়াক পেশি একটা নির্দিষ্ট গতিতে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সচল রাখে।

(d) স্নায়ু টিস্যু (Nerve tissue)

দেহের বিশেষ সংবেদী কোষ নিউরন বা স্নায়ুকোষগুলো একত্রে স্নায়ু টিস্যু গঠন করে। স্নায়ু টিস্যু অসংখ্য নিউরন দিয়ে গঠিত। এর গঠন সম্পর্কে তোমরা দশম অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবে। স্নায়ু টিস্যু পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা, যেমন তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি গ্রহণ করে দেহের ভিতরে মস্তিষ্কে বহন করে এবং মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ করে থাকে। একটি আদর্শ নিউরনের দুটি অংশ- কোষদেহ এবং প্রলম্বিত অংশ। প্রলম্বিত অংশ আবার দুই ধরনের- অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইট। নিউরন কোষ বহুভুজাকৃতি এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। কোষের সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজিবডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি থাকে। তবে নিউরনের সাইটোপ্লাজমে সক্রিয় সেন্ট্রিওল থাকে না বলে নিউরন বিভাজিত হয় না। কোষদেহের চারদিকের শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে ডেনড্রন বলে। ডেনড্রন থেকে যে শাখা বের হয়, তাদের ডেনড্রাইট বলে। ডেনড্রাইটের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। নিউরনের কোষদেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যাক্সন বলে। একটি নিউরনের একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে। পরপর দুটি নিউরনে প্রথমটির অ্যাক্সন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি গঠিত হয়, তাকে সিন্যাপস (Synapse) বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে পরিবাহিত হয়। স্নায়ুটিস্যু উদ্দীপনা গ্রহণ করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে এবং মস্তিষ্ক তাতে সাড়া দেয়। উচ্চতর প্রাণীতে স্নায়ুটিস্যু স্মৃতি সংরক্ষণ (Memorise) করাসহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

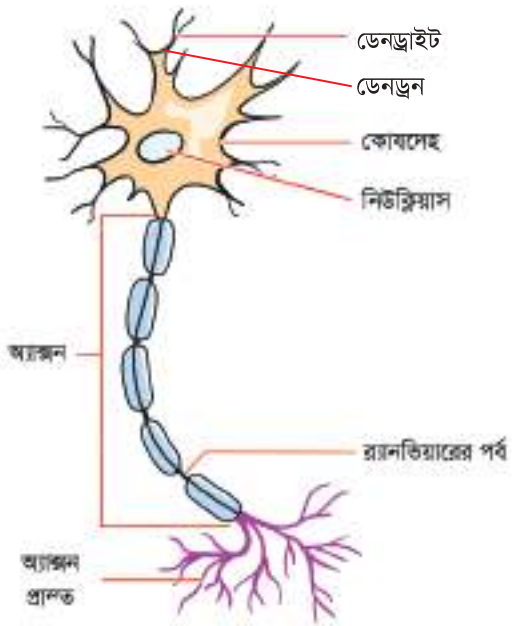

চিত্র ২.২৪: একটি নিউরন

অনেকের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, আমরা আমাদের মস্তিষ্কের মাত্র দশ শতাংশ ব্যবহার করতে পারি। ধারণাটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বা অন্য সব প্রাণী তার মস্তিষ্কের একশো শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। এটা ঠিক যে, সবসময় একই সাথে মস্তিষ্কের সকল অংশ সমানভাবে সক্রিয় থাকে না। কিন্তু মস্তিষ্কের সবগুলো অংশ কখনো না কখনো আমরা কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করে থাকি।

২.৪ অঙ্গ ও তন্ত্র

এক বা একাধিক টিস্যু দিয়ে তৈরি এবং একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম প্রাণিদেহের অংশবিশেষকে অঙ্গ (Organ) বলে। অর্থাৎ কোনো অঙ্গে একই অথবা একাধিক ধরনের টিস্যু থাকে এবং সেই অঙ্গ কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। দেহের অঙ্গসমূহ নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Morphology) বলে।

অবস্থানভেদে মানবদেহে দুধরনের অঙ্গ আছে। চোখ, কান, নাক, হাত, পা, মাথা— এগুলো বাহ্যিক অঙ্গ। বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে বহিঃঅঙ্গসংস্থান (External Morphology) বলে। আর জীবদেহের ভিতরের অঙ্গগুলো সম্বন্ধে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে অন্তঃঅঙ্গসংস্থান (Internal morphology বা Anatomy) বলে। পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, মলাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়— এগুলো হচ্ছে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ।

পরিপাক, শ্বসন, রেচন, প্রজনন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কাজ করার জন্য প্রাণিদেহে কতগুলো অঙ্গের সমন্বয়ে বিভিন্ন তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে মানবদেহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের ধারণা দেওয়া হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(a) পরিপাকতন্ত্র (Digestive system)

এই তন্ত্র খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক, শোষণ এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ নিষ্কাশনের সাথে জড়িত। পরিপাকতন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা: পৌষ্টিক নালি (digestive canal) এবং পৌষ্টিক গ্রন্থি (digestive glands)। মুখছিদ্র, মুখগহ্বর, গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলী, ডিওডেনাম, ইলিয়াম, রেকটাম বা মলাশয় এবং পায়ুছিদ্র নিয়ে পৌষ্টিক নালি গঠিত। মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পৌষ্টিক গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। এসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

(b) শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

নাসারন্ধ্র, গলবিল, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলাই এবং একজোড়া ফুসফুস নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। এই তন্ত্র পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেনের সাহায্যে মানুষের দেহের সঞ্চিত খাদ্য থেকে জারণ প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদন করে। এ শক্তি দেহের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করে।

(c) স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

দেহের বাইরের এবং ভিতরের উদ্দীপনা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা এই তন্ত্রের কাজ। মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড এবং করোটিক স্নায়ু নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র নামে স্নায়ুতন্ত্রের আরও একটি অংশ আছে। স্নায়ুতন্ত্রের এই অংশ দেহের অনৈচ্ছিক পেশির কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

(d) রেচনতন্ত্র (Excretory system)

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় বিপাক ক্রিয়ার ফলে শরীরে উপজাত দ্রব্য হিসেবে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়। এসব বর্জ্য পদার্থ সাধারণত দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং দেহ থেকে নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। দেহ থেকে এসব অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন প্রক্রিয়া বলে। যে তন্ত্রের সাহায্যে রেচন প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে রেচনতন্ত্র বলে। একজোড়া বৃক্ক, একজোড়া ইউরেটার, একটি মূত্রথলি এবং একটি মূত্রনালি (ইউরেথ্রা) নিয়ে মানুষের রেচন তন্ত্র গঠিত।

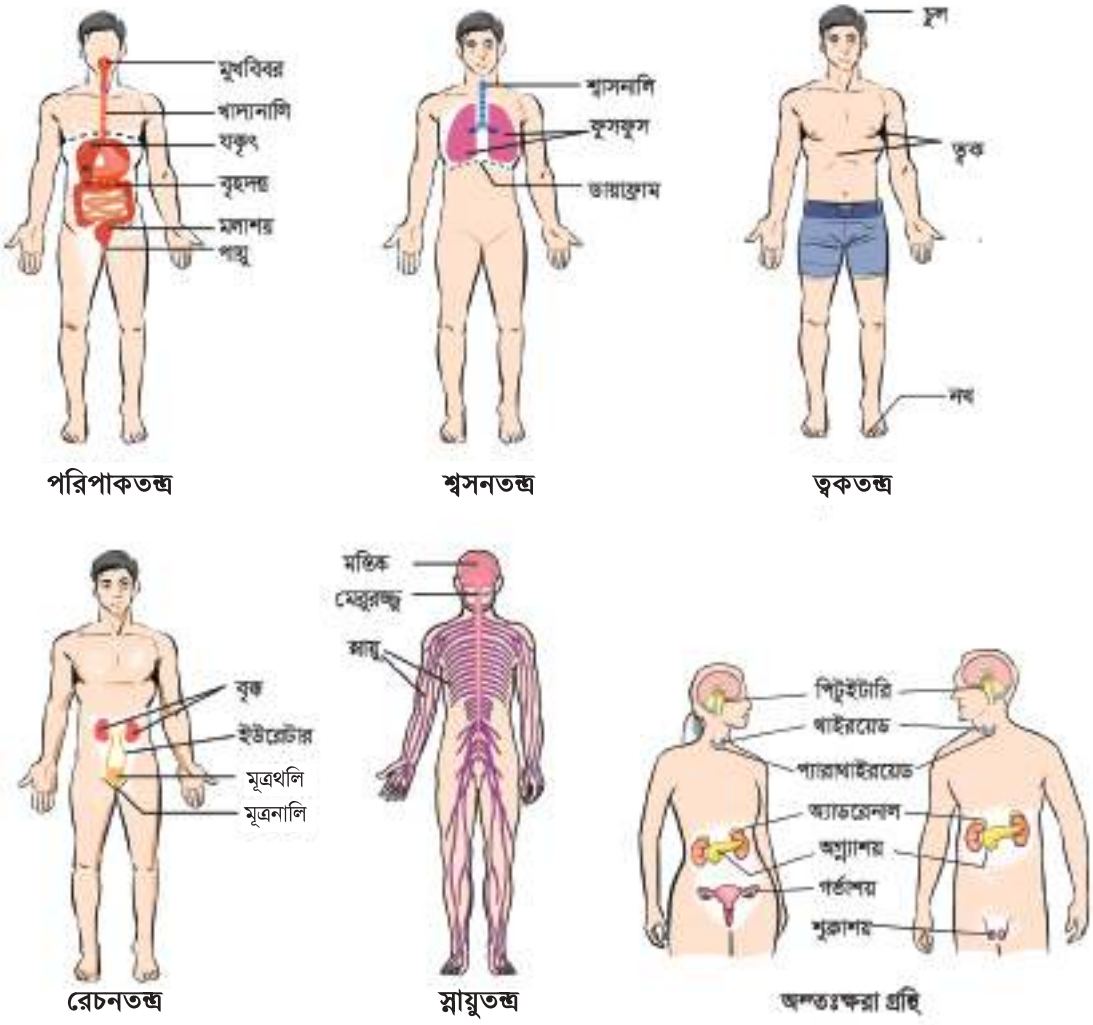

চিত্র ২.২৫: মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের সরল চিত্র

(e) জননতন্ত্র (Reproductive system)

প্রজাতির ধারাকে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই তন্ত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্যামেট (অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) তৈরি করে। এটি ভ্রূণ ও শিশু ধারক অঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণত পরিণত বয়সে জননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণী প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে প্রজননের মাধ্যমে প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ মানুষের দেহে পুরুষ প্রজননতন্ত্র এবং নারীর দেহে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র থাকে।

(f) ত্বকতন্ত্র (Integumentary system)

দেহের বাইরের দিকে যে আচ্ছাদনকারী আবরণ থাকে, তাকে ত্বক বা চামড়া (skin) বলে। কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থিযুক্ত এই ত্বক দেহকে আচ্ছাদন করে, বাইরের আঘাত এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া দেহের জলীয় অংশকে দেহের ভিতর সংরক্ষণ করে।

(g) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system)

প্রাণিদেহে কতগুলো নালিহীন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে হরমোন বলে। পরিবহন করার জন্য এর কোনো নির্দিষ্ট নালি থাকে না। শুধু রক্তের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হরমোন পরিবাহিত হয়। পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস, সুপ্রারেনাল ইত্যাদি গ্রন্থির সমন্বয়ে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র গঠিত।

২.৫ অণুবীক্ষণ যন্ত্র

যোদ্ধার কাছে যেমন অস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ঠিক তেমনি জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাছে অণুবীক্ষণ যন্ত্র একটি অপরিহার্য গবেষণা সহায়ক উপকরণ। এর সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে বহুগুণ বড় করে দেখা যায়। তোমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে, তাতে আলোর সাহায্যে এসব ক্ষুদ্র বস্তু দেখার ব্যবস্থা আছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোর বদলে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, তাকে ইলেকট্রন (ইলেকট্রনিক নয়) অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দুধরনের, সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

২.৫.১ সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple microscope)

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফুটের উপরে একটি স্তম্ভ থাকে, যার সাথে একটি কাচের স্টেজ সংযুক্ত থাকে। এই কাচের স্টেজে দুটো ক্লিপ লাগানো থাকে। স্ট্যান্ডের নিচের দিকে সম্মুখভাগে একটি আয়না রয়েছে। স্তম্ভের উপরে একটি টানা নল এবং এর বাহুতে লেন্স ধরে রাখার জন্য আংটা থাকে। এই আংটায়

চিত্র ২.২৬: একটি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

লেন্স বসিয়ে এডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর ফোকাস করা যায়। আয়না দিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুতে আলো প্রতিফলিত করে পরীক্ষার কাজ শুরু করতে হবে। যে ভিত্তির উপর যন্ত্রটি দাঁড়িয়ে, সেটিকে ফুট বলে।

২.৫.২ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Microscope)

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানার পূর্বে এর বিভিন্ন অংশগুলোর নাম জেনে নেওয়া প্রয়োজন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চিত্রটি লক্ষ করো।

স্ট্যান্ড: এটি বেজ-এর উপর দণ্ডায়মান একটি উল্লম্ব পিলার।

আর্ম: স্ট্যান্ড-এর উপরের দিকে বাঁকানো অংশকে আর্ম বলে।

ফুট: স্ট্যান্ড-এর নিচের দিকে পাটাতনের মতো অংশটির নাম ফুট।

স্টেজ: আর্ম-এর নিচের অংশে স্টেজ লাগানো থাকে।

বডি টিউব: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপরের দিককার একটি নলাকার অংশ যার একপ্রান্তে আইপিস এবং অপর প্রান্তে অবজেকটিভ লেন্সগুলো লাগানো থাকে।

নোজপিস ও অবজেকটিভ: বডি টিউবের নিচের দিকের ঘূর্ণনশীল অংশটিকে নোজপিস বলে। এতে তিনটি অবজেকটিভ (লেন্স) লাগানো থাকে, যথা- লো পাওয়ার অবজেকটিভ (10x-12x), হাই পাওয়ার অবজেকটিভ (40x-45x), অয়েল ইমারশন অবজেকটিভ (100x)। কোনো কোনো যন্ত্রে অবশ্য আরও একটি অবজেকটিভ থাকে, যাকে বলে স্ক্রিনিং অবজেকটিভ (4x-5x)। এখানে x এর সাথে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো নির্দেশ করছে যে, উক্ত লেন্স বা লেন্স সমবায় দ্বারা কতগুণ বিবর্ধন ঘটে।

আইপিস: বডি টিউবের উপরের অংশে একটি (monocular) বা দুটি (binocular) আইপিস (লেন্স) লাগানো থাকে। এর বিবর্ধন ক্ষমতা সাধারণত 10x-12x হয়।

ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট নব: এটি একটি ছোট নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের (focal length) ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অনেকখানি ঘোরালে স্টেজের অল্প একটু সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের সূক্ষ্ম সমন্বয় করা হয়।

চিত্র ২.২৭: যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট নব: এটি একটি বড় নব। এটিকে ঘুরিয়ে স্টেজকে ওঠা-নামা করানোর মাধ্যমে স্লাইডকে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের ভিতরে বা বাইরে নেওয়া যায়। এটিকে অল্প ঘোরালেই স্টেজের অনেকখানি সরণ ঘটে অর্থাৎ এটি দিয়ে ফোকাসের স্থূল সমন্বয় করা হয়।

সাবস্টেজ ডায়াফ্রাম ও কনডেন্সার: স্টেজের নিচে সাবস্টেজ অবস্থিত যেটা উঠা-নামা করানো যায় এবং এর সাথে একটি কনডেন্সার লাগানো থাকে। কনডেন্সারের মধ্যে একটি ডায়াফ্রাম বা পর্দা থাকে, যেটা কতটুকু আলো কনডেন্সারের ভিতরে প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করে।

আলোর উৎস: বেজ-এর কেন্দ্রে একটি আলোর উৎস (যেমন: আয়না বা বৈদ্যুতিক বাতি) থাকে, যেখান থেকে আলো কনডেন্সারের মধ্য দিয়ে লেন্সে প্রবেশ করে।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে চাইলে গবেষণাগারের আলোকিত স্থানে এটি স্থাপন করতে হবে। প্রথমেই আয়নাটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি মঞ্চটির ছিদ্র বরাবর বসানো কাচের স্লাইডের নিচে প্রতিফলিত হয়। আর যদি কৃত্রিম আলোক উৎস অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে, তাহলে শুধু সেটি জ্বালালেই চলবে। যে স্লাইডটি পর্যবেক্ষণ করা হবে তা মঞ্চের ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দিতে হবে। এরপর নোজপিস ঘুরিয়ে নিয়ে অবজেকটিভের কম পাওয়ারের লেন্স স্লাইড বরাবর স্থাপন করতে হবে। এবার প্রথমে কোর্স অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু এবং পরে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে দেখার বস্তুটি ফোকাসে আনতে হবে। এবার বডি টিউবে স্থাপিত আইপিস লেন্সে চোখ রেখে দেখতে হবে। প্রয়োজনে ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে। মনোকুলার হোক বা বাইনোকুলার, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার সময় দুটি চোখই খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে কষ্ট হলেও ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে। এক চোখে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দেখলে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি উচ্চ পাওয়ারের দরকার হয়, তবে অবশ্যই শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে নোজপিস ঘুরিয়ে উচ্চ পাওয়ারের লেন্স স্থাপন করতে হবে।

স্টেইনিং (staining)

কোষ বা টিস্যুর পাতলা স্তরকে যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা হয়, তখন সেটি যে জলীয় মাধ্যমে অবস্থান করে, তার থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। এ সমস্যা সমাধান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি উপায় হলো ওই কোষ বা টিস্যুকে রং করা, যাতে সেই রং দেখে পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে তার অবস্থান এবং আকৃতি আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। অনেক সময় এই রঞ্জন প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্মতার সাথে করা সম্ভব, যাতে করে শুধু বিশেষ ধরনের কোষ কিংবা কোষের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গাণু অথবা টিস্যুর নির্দিষ্ট কোনো উপাদানই কেবল রঙিন হয়। একেই বলে স্লাইড স্টেইনিং। যেসব রঞ্জক পদার্থ দিয়ে স্টেইনিং করা হয়, সেগুলোকে একত্রে স্টেইন (stain) বলে।

চিত্র ২.২৮: ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

২.৫.৩ ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron microscope)

বিবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হবে, তত ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করা সম্ভব হবে। সাধারণত বিবর্ধনে ব্যবহৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেকের চেয়ে ছোট বস্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতো করে ফোকাস করা সম্ভব নয়। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400-700 ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে। তাই সবচেয়ে উন্নতমানের আলোক অণুবীক্ষণেও 200 ন্যানোমিটারের থেকে ছোট বস্তুকে বিবর্ধিত করে দেখা যায় না, এমনকি অনেক শক্তিশালী বহুসংখ্যক লেন্সের সমন্বয় করেও সেটি করা যায় না। ফলে আলোক অণুবীক্ষণে কোষের কোষঝিল্লি, নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম ছাড়া আর কিছু খুব একটা ভালো করে বোঝা যায় না। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অঙ্গাণুগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে ইলেক্ট্রন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কেননা ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট করা সম্ভব। কাচের লেন্সের পরিবর্তে সেখানে ব্যবহৃত হয় শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক, যা ইলেক্ট্রন স্রোতের গতিপথ বাঁকিয়ে দিতে পারে, ঠিক যেরকম কাচ, আলোকে বাঁকিয়ে দেয়। ফলে কোষের ভেতরকার অঙ্গাণুগুলো স্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়। যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইলেক্ট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করে বিবর্ধন করা হয়, তাকে ইলেক্ট্রন (ইলেক্ট্রনিক নয়) মাইক্রোস্কোপ (electron microscope) বা ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। উল্লেখ্য, ইলেক্ট্রন তরঙ্গ দিয়ে তৈরি করা ছবি আমরা সরাসরি চোখে দেখতে পাই না। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত একটি কম্পিউটার ঐ অদৃশ্য ছবিকে আমাদের দেখার উপযোগী ছবিতে পরিণত করে যা, কম্পিউটারের মনিটরে দৃশ্যমান হয়।

একক কাজ

কাজ : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদকোষ (পেঁয়াজ কোষ) পর্যবেক্ষণ করো।

প্রয়োজনীয় উপাদান: পেঁয়াজ, ব্লেড, স্লাইড, কভার স্লিপ, ওয়াচ গ্লাস, তুলি, গ্লিসারিন, স্যাফ্রানিন দ্রবণ, ড্রপার, ব্লটিং পেপার এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

পদ্ধতি: পেঁয়াজ থেকে শুকনো খোসাগুলো ছাড়িয়ে নাও। এবার যেকোনো একটি স্ফীত, রসাল শল্কপত্র

নাও। ব্লেড দিয়ে শল্কপত্রের উপরিভাগ থেকে সামান্য ত্বকস্তর তুলে নিয়ে ওয়াচ গ্লাসের পানিতে রাখ। আরেকটি ওয়াচ গ্লাসে স্যাফ্রানিন দ্রবণ নাও। এবারে তুলির সাহয্যে প্রথম ওয়াচ গ্লাসের পানি থেকে ত্বকস্তর তুলে নিয়ে দ্বিতীয় ওয়াচ গ্লাসের স্যাফ্রানিন দ্রবণে রাখ এবং ৩০ সেকেন্ড অপেক্ষা করো। তারপর তুলি দিয়ে স্যাফ্রানিনরঞ্জিত ওয়াচ গ্লাস থেকে ত্বকস্তরটি আবার প্রথম ওয়াচ গ্লাসের পানিতে রাখ। উল্লেখ্য স্যাফ্রানিন এখানে স্টেইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি পরিষ্কার শুষ্ক স্লাইডের উপর ২-৩ ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর ধীরে ধীরে কভার স্লিপ রাখ যেন বাতাস বা বুদ্‌বুদ না ঢোকে। কভার স্লিপের বাইরে থাকা অতিরিক্ত দ্রবণ/গ্লিসারিন ব্লটিং পেপার দিয়ে সাবধানে শুষে নাও।

পর্যবেক্ষণ: যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ (Objective) দিয়ে দেখো। আয়তাকার, পাতলা কোষপ্রাচীরযুক্ত কোষ দেখতে পাবে। এবার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অভিলক্ষ দিয়ে দেখো। প্রতিটি কোষে পাতলা দানাযুক্ত প্রোটোপ্লাজম, কোষগহ্বর এবং একপাশে একটি নিউক্লিয়াস দেখতে পাবে। এবার যা যা দেখলে তার চিত্র খাতায় এঁকে চিহ্নিত করো।

একক কাজ

কাজ: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রাণিকোষ (মুখের ভেতরকার পার্শ্বীয় আবরণীর কোষ) (buccal mucosa cell) পর্যবেক্ষণ করো।

প্রয়োজনীয় উপাদান: অণুবীক্ষণ যন্ত্র, স্লাইড, কভার স্লিপ, মিথাইলিন ব্লু (Methylene blue) দ্রবণ, গ্লিসারিন, ড্রপার, ব্লটিং পেপার, তুলি।

সাবধানতা: মিথাইলিন ব্লু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এটি নিয়ে কাজ করার সময় গ্লাভস, চশমা, মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

পদ্ধতি: পরিষ্কার স্লাইডের এক প্রান্তে ১-২ ফোঁটা পানি নাও। তারপর পরিষ্কার শুষ্ক একটি আঙুল দিয়ে গালের ভেতরের চকচকে আবরণীর উপর আলতোভাবে ঘষো, এর ফলে এতে আবরণী কলার কিছু কোষ লেগে যাবে। শিক্ষকের সহায়তা নাও যাতে এটি করতে গিয়ে আঘাত না লাগে। যে আঙুল দিয়ে গালের ভেতরে ঘষা হয়েছে সেটি ঐ স্লাইডের পানিতে ধরো এবং সমানভাবে ঘষে স্লাইডের অপর প্রান্তের দিকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত টেনে পানি ছড়িয়ে দাও। প্রাণিকোষে যেহেতু কোষপ্রাচীর থাকে না, তাই বেশি শক্তি প্রয়োগ করে ঘষলে কোষগুলো সহজেই বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সাবধান! তারপর ড্রপার দিয়ে কয়েক ফোঁটা মিথাইলিন ব্লু দ্রবণ সেই স্লাইডের পানি লাগানো অংশে ছড়িয়ে দাও। কাজটি করার সময় স্লাইডটি যেন ভূমির সমান্তরাল থাকে, তা লক্ষ রেখো। তারপর ২-৩ মিনিট অপেক্ষা করো। উল্লেখ্য, মিথাইলিন ব্লু এখানে স্টেইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন স্লাইডের মাঝামাঝি অংশে ড্রপার দিয়ে ২-৩ ফোঁটা গ্লিসারিন ফেলো এবং তার উপরে ধীরে ধীরে স্লাইডের সমান্তরালভাবে একটি কভার স্লিপ স্থাপন করো। খেয়াল রাখতে হবে কভার স্লিপের নিচে যেন বাতাস বা বুদ্বুদ না ঢোকে। কভার স্লিপটির উপর দিয়ে আলতোভাবে চাপ দাও যাতে কোষগুলো তার নিচে সমানভাবে ছড়ায়। কভার স্লিপের এলাকার বাইরে থাকা অতিরিক্ত দ্রবণ/গ্লিসারিন ব্লটিং পেপার দিয়ে সাবধানে শুষে নাও।

পর্যবেক্ষণ: অণুবীক্ষণের নিচে একটু ফোকাস করলেই দেখতে পাবে বহুভূজাকার অনেকগুলো কোষ। সেগুলোয় কোনো কোষ প্রাচীর, প্লাস্টিড বা কোষ গহ্বর দেখা যাবে না। কোষের সীমানা জুড়ে পাতলা কোষঝিল্লি এবং কেন্দ্রে একটি করে নিউক্লিয়াস। কোষগুলো যদি ভালো করে না ছড়ানো হয় তাহলে সেগুলোকে একে অপরের উপর উঠে থাকতে (overlapping) দেখা যেতে পারে।

বি.দ্র: মিথাইলিন ব্লু বা কোনো রঞ্জক ব্যবহার না করেও পরীক্ষাটি করা যায়। সেক্ষেত্রে কোষ পর্যবেক্ষণ করা কিছুটা শ্রমসাধ্য হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লাইসোজোমের কাজ কোনটি?

ক. খাদ্য তৈরি
খ. শক্তি উৎপাদন
গ. জীবাণু ভক্ষণ
ঘ. প্রোটিন সংশ্লেষণ

২. অ্যামিবা একটি প্রাণিকোষ, কারণ এর—

i. সুসংগঠিত কেন্দ্রিকা রয়েছে
ii. বর্ণগঠনকারী কণিকা আছে
iii. কোষঝিল্লি উপস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিয়াসাত গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখলো, একজন লোক খালের পাড়ে পাট থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে। সে পরে আরো লক্ষ করলো, পানিতে অনেক কচুরিপানা ভাসছে।

৩. উদ্দীপকের উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে ছাড়ানো অংশে কোন ধরনের টিস্যু রয়েছে?

ক. অ্যারেনকাইমা
খ. কোলেনকাইমা
গ. ক্লোরেনকাইমা
ঘ. স্ক্লেরেনকাইমা

৪. পরবর্তীতে রিয়াসাতের দেখা উদ্ভিদটির টিস্যুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. কোষগুলো বায়ুকুঠুরিযুক্ত
ii. কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব অসমান
iii. কোষ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে পূর্ণ থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

M

N

P

ক. প্লাজমালেমা কী?

খ. প্লাস্টিডকে বর্ণগঠনকারী অঙ্গাণু বলা হয় কেন?

গ. জীবের জন্য M চিত্রের অঙ্গাণু গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. N ও P এর মধ্যে একটি জীবদেহে শক্তি উৎপন্ন করলেও অপরটি বংশগতিতে ভূমিকা পালন করে— যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

২.

M

X

Y

Z

ক. পেশি টিস্যু কী?

খ. স্কেলিটাল টিস্যু কীভাবে মস্তিস্ককে রক্ষা করে?

গ. M চিত্রের টিস্যু শনাক্ত করে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জীবদেহের বিভিন্ন জৈবিক কাজে X, Y ও Z এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. টিস্যু ও অঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

২. পরাগায়নে ক্রোমোপ্লাস্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৩. পরিবহণ টিস্যুকে জটিল টিস্যু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

৪. কোন টিস্যু জলজ উদ্ভিদকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করো।

৫. থাইরয়েডকে কেন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।